বিজয় দিবসের কথা

তাসরীনা শিখা

ডিসেম্বর মাস। আমাদের বিজয়ের মাস। আমাদের গৌরবের মাস। আমদের অর্জনের মাস। এই অর্জনের মাসেই আমরা পেয়েছিলাম আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশকে। এই স্বপ্ন আমাদের কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে লিখতে গেলে সে লেখা হয়ে যায় রাজনৈতিক লেখা। রাজনীতি নিয়ে কিংবা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আমি কখনো বেশী কিছু লিখতাম না, আসলে লিখতে চাইতাম না। কথা প্রসঙ্গে যখন এসে গেছে তখনই লিখেছি। রাজনীতি নিয়ে লিখতে চাইনা বলাতে বাংলাদেশে রিপোর্টার হিসেবে কাজ করতো আমার এমন একজন পরিচিত বলেছিল, 'রাজনীতি নিয়ে লিখতে চান না কেন? রাজনীতিতো জীবনেরই একটি অংশ'। আসলে বাংলাদেশের বিশেষ কোন রাজনৈতিক অবস্থা যখন মনকে ভীষনভাবে নাড়া দেয় তখন কিছু লেখার চেষ্টা করি। বিজয় দিবসের কথা লিখতে হলে উচ্ছাসে আবেগে আনন্দে ভরপুর হয়েই কিছু লেখার কথা বা লিখাই উচিৎ। কিন্তু আজ দেশের যে অবস্থা সে অবস্থা চোখের সামনে রেখে কি উচ্ছলতা আমি প্রকাশ করবো? কোন রূপসী বাংলার বর্ননায় আমি আবেগে ভরে উঠবো? বেশ অনেকদিন আগে আমার লেখার একজন পাঠক আমাকে বলেছিলেন, "আপনার লেখায় আওয়ামীলীগের গন্ধ পাই'। ঠিক এধরনের একটি মন্তব্য করেছিলেন এখানকার একজন লেখক যিনি নিয়মিত পত্রিকায় লেখেন। তার সাথে কথা প্রসঙ্গে যখন আমার স্বামীর নামটি বলেছিলাম তিনিও আমাকে একই ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন। 'আচ্ছা উনি আপনার স্বামী, যিনি আওয়ামীলীগ করেন' (যদিও আমার অধ্যাপক স্বামী কখনো আওয়ামীলীগের কোন সদস্য ছিলেন না এবং এখনও নেই)। এ দুজনকেই আমি একই জবাব দিয়েছিলাম। দেশকে ভালোবেসে কিছু লিখলে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করলে এবং বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা হিসেবে শ্রদ্ধা করলে যদি আওয়ামী লীগ হয় তাহলে আমার কিছু বলার নেই।

আসলে বাংলাদেশ এখন দুই ধর্মের মানুষ বসবাস করে। বি এন পি + জামাত এবং আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশে নেই হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান কোন কিছু। আওয়ামীলীগ সৃষ্টি হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতা ও গনতন্ত্রের চেতনার ভিত্তিতে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যালঘুরা আওয়ামীলীগকে সমর্থন করে নিরবে বা সরবে। তারা নিরপেক্ষ ও নিরীহ থাকলেও ধরে নেয়া হয় তারা আওয়ামীলীগের সমর্থক। যার ফলে বর্তমান সরকারের ক্যাডারদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে সংখ্যালঘুরা সর্বক্ষেত্রে। যারা সরকারী পক্ষকে বা তাদের কার্যকলাপকে সমর্থন করে না ধরেই নেয়া হয় তারা বিরোধীদলের সমর্থক। নিরপেক্ষ শব্দটা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে। আমি আজ লিখতে বসেছিলাম বিজয় দিবস সম্স্লর্কে। অথচ আমি বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছি আমার প্রসঙ্গ থেকে।

উনিশ 'শ একাত্তুর সাল ষোলই ডিসেম্বর। বিজয়ের দিন। অনেক স্মৃতিগাথা একটি দিন। এতে ছিল দেশ স্বাধীনতার অপরিসীম আনন্দ, ছিল পুত্র হারানোর ব্যথা, ছিল কন্যা বিসর্জনের অব্যক্ত অপমান ও বেদনা। তার পরেও এ দিনটি আনন্দের, গৌরবের। সাতই মার্চের সেই বজ্রকণ্ঠের ঘোষনা অনুপ্রানিত করেছিল বাঙ্গালী জাতিকে। 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। উনিশ 'শ একাত্তুর সালের ষোলই ডিসেম্বর মানুষের স্রোত নেমে এসেছিল রাজপথে। ঘর থেকে আনন্দে বেরিয়ে এসেছিল সারা বাংলাদেশের মানুষ। মুক্তিযোদ্ধাদের অভিনন্দন জানাচ্ছিল স্লোগান দিয়ে, ফুল ছিটিয়ে, হাত নেড়ে। সেদিন আমি দেখেছিলাম আমাদের প্রতিবেশী বশীর চাচার রকিংচেয়ারে বসে দুলে দুলে ডুকরে ডুকরে কান্না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই একমাত্র ছেলের দিকে তাকিয়ে বিয়ে করেননি বশীর চাচা। ছেলে যোগ দিয়েছিল মুক্তিবাহিনীতে। দেশের স্বাধীনতা এসেছে, বিজয়ের আনন্দে মেতে উঠেছে দেশ। ফিরে এসেছে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা। ফিরে আসেনি বশীর চাচার ছেলে। তিনি বিজয় দেখেছেন, কিন্তু পুত্র হারানোর শোকে অনুভব করতে পারেননি বিজয়ের আনন্দকে। তিনি দেখেছেন তার আকুল কান্নায় তার ছেলের মত লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে।

কমলা ঘোষ। আমরা ডাকতাম কমলাদি বলে। এই হিন্দু পরিবারটির সাথে আামাদের হৃদত্যা ছিল বহু বছরের। কমলাদি আমার চাইতে বয়সে আনেক বড় ছিলেন। গান গাইতেন বড় মিষ্টি কণ্ঠে। আমাদের এই দুই পরিবারের সদস্যদের অবাধ আসা যাওয়া ছিল। কমলাদি এলেই মা বলতেন, "কমলা একটা গান ধর না"। কমলাদিও একটু হেসে কেশে বলতেন, "আচ্ছা মাসিমা"। উনিশ 'শ একাত্তরের মার্চ মাসের একেবারে প্রথম দিককার কোন এক দিন সন্ধ্যার দিকে কমলাদিরা এসেছিলেন আমাদের বাড়ীতে। বাবা মা'রা সব ব্যস্ত দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায়। কমলাদি আমাদের চার বোনকে নিয়ে গিয়েছিলেন বারান্দায়। নিজে আরাম করে বসে বললেন, "বোস, তোদেরকে আজ অনেক গান শুনাবো"। সেদিন জোৎস্নায় ভরে গিয়েছিল আমাদের বাড়ীর পিছনের উঠোন আর বারান্দা। কমলাদি চোখ বন্ধ করে গান ধরলেন, "চাদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে উছলে পরে আলো"। "আজ জোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে"। আরও অনেক গান। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে ছিলাম কমলাদির জোৎস্নার আলো পড়া মিষ্টি চেহারার দিকে। তারপর এলো ২৫শে মার্চের কাল রাত্রি। আমরা সবাই ছিটকে চলে গেলাম যার যার নিরাপদ আশ্রয়ে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হবার পর ফিরে এসছিলাম আমরা নিজেদের বাড়ীতে। এসেই আমার মা খোঁজ নিলেন কমলাদিদের বাড়ীর। বাড়িতে কেই নেই, শুন্য বাড়ী। কমলাদির বাবা এ কমাসে বিশ বছর বয়স বেড়ে যাওয়া চেহারা নিয়ে বাড়ী আগলে বসেছিলেন। তিনি জানালেন স্ত্রী সন্তানদের ইন্ডিয়া পাঠিয়ে দিয়েছেন। আামার বাবা মা প্রশ্ন করেছিলেন তাকে তিনি কেন একা একা পড়ে আছেন জীবনের ঝুকি নিয়ে।

জবাবে কমলাদির বাবা আকুল হয়ে কেঁদেছিলেন কোন জবাব দেননি। তখন আমার এত কিছু বোঝার বয়স ছিল না, কিংবা আমাকে কেউ বুঝাবার চেষ্টাও করেনি। হালকাভাবে বন্ধবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে যতটুকু শুনেছিলাম ততটুকুতে বুঝতে পেরেছিলাম পাকবাহিনী কমলাদিদির বাড়ীতে ঢুকেছিল। তার ভাইরা আগেই ইন্ডিয়াতে চলে গিয়েছিল। কমলাদির বাবা স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে দুই একদিনের মাঝেই যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু সে যাওয়া তার আর হয়নি। কমলাদিকে ধরে নিয়ে যায় পাক বাহিনী। স্ত্রীকে ইন্ডিয়া পাঠিয়ে দিয়ে পিতা থাকেন মেয়ের অপেক্ষায়। মেয়েকে যদি তারা ফিরিয়ে দিয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কমলাদি নাকি ফিরে এসেছিলেন, নির্যাতিত কমলাদি, বীরঙ্গনা কমলাদি। আমি তাকে দেখিনি, দেখার সুযোগ আমরা পাইনি। অল্পদিনের মধ্যেই কমলাদির বাবা মেয়েকে নিয়ে চলে যান ভারতে। মাকে দেখেছি কেঁদে কেঁদে বলতে, "আহারা এত সুন্দর চুলগুলি কেন ওরা এত কুচি কুচি করে কেটে দিয়েছে"। আরো কি সব বলছিলেন আমরা ভালো করে বুঝতে পারিনি। আরো বড় হয়ে সব ঘটনা জেনেছি, বুঝেছি। বুঝতে পেরে অনেক কেঁদেছি কমলাদির জন্য। সেই কমলাদিকে আমি আর কখনো দেখিনি, তার গান আন কখনো শুনিনি। প্রতিটি ডিসেম্বর মাসে আমার নুতন করে মনে পড়ে আমাদের দীর্ঘকেশী অপুর্ব মিষ্টি চেহারার মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠের কমলাদিকে। যিনি ছিলেন আমাদের ভীষন কাছের একজন মানুষ। আজও ভাবি কোথায় সেই কমলাদি? কি হয়েছিল তার জীবনের? তিনি কি সংসারী হতে পেরেছিলেন কখনো? স্বাধীনতার চৌত্রিশ বছর পরও আমার 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে' গানটি চোখে অশ্রু আনে। আমার চোখ ভেসে উঠে জোৎস্না মাখা কমলাদির চেহারা। এমনি লাখো কমলাদির বিসর্জন, লাখো বশীর চাচার ছেলেদের আত্মত্যাগে অর্জিত আমাদের এই বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার ৩৪ বছর পরও আমরা আক্ষেপে বসি আমরা কি এজন্য দেশ স্বাধীন করেছিলাম? বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তার বেশীর ভাগই হয়ত ব্যর্থ হয়েছে। তবে প্রাপ্তি যে কিছুই হয়নি তাইবা বলি কি করে? শত সহস্র অনিয়ম, অসুস্থতা ও নিশংসতার মাঝেও বলি মুক্তিযুদ্ধ তো আমাদের একটি বিজয় দিয়েছিল, একটি দেশ দিয়েছে। যে দেশের পাসপোর্ট নিয়ে আমরা হাজার হাজার বাঙালী প্রবাসে বাস করছি। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি। আমাদের সন্তানরা বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। দেশে বস্ত্র শিল্পের উন্নতি হয়েছে, বানিজ্যিক ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। হোক সেটা সরকারী বা বেসরকারী প্রচেষ্টাতেই। আমরা যে টুকু পেয়েছি তা ভোগ করছি, আর যে প্রাপ্তির চেষ্টায় আমরা ব্যর্থ হয়েছি, আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে সেভাবে আমাদের ব্যর্থতাকে, আমাদের দু:খকে, আমাদের কষ্টকে যেন তারা ঘুচাতে পারে। তাদের মনে দেশের প্রতি ভালোবাসা ও সত্য ইতিহাসের বীজ বুনে দেয়ার দায়িত্বতো আমাদেরই। আজকের শিশু যেন বিজয় দিবসের দিনে আমাদের মত চোখে জল এনে না বলে আমরা এমন বাংলাদেশ চাইনি। তারা যেন বুক ফুলিয়ে বলতে পারে আমাদের পুর্বপুরুষেরা সংগ্রাম করে

স্বাধীনতা অর্জন করেছিল বলেই আমরা আজ গর্ব করে বলতে পারছি, "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি"।